بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ মোতাবেক ১৬ তবলীগ, ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

একজন মু'মিন বা এমন ব্যক্তি, যার দাবি হলো, আমি আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখি, তাকে সবসময় খোদার এ নির্দেশ নিজের সামনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেছেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা আয্ যারিয়াত: ৫৭) অর্থাৎ আমি জিন্ন ও ইনসানকে আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইবাদতের পদ্ধতিও শিখিয়েছেন, যার মধ্যে ব্যবহারিক দিকও রয়েছে অর্থাৎ বাহ্যিক ওঠাবসা বা অঙ্গ-সঞ্চালনা এবং দোয়ার শব্দাবলীও রয়েছে, যাকে 'যিক্র'ও বলা যেতে পারে। নামাযে এ উভয় দিকই অন্তর্নিহিত রয়েছে অর্থাৎ বাহ্যিক অঙ্গভঙ্গিও রয়েছে আর যিক্র ও দোয়াও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নামায ছাড়াও যিক্র করা, দোয়া করা এবং খোদা তা'লাকে স্মরণ রাখা একজন মু'মিনের দায়িত্ব। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন নবীর বরাতে বহু দোয়ার উল্লেখ করেছেন যা আমরা নামাযেও পড়তে পারি এবং চলাফেরার সময় যিক্র হিসেবেও পড়ে থাকি আর পড়তে পারি। মানুষজন তাদের দেয়া চিঠিপত্রে লিখে যে, আমরা অমুক সমস্যার সম্মুখীন, অমুক দুশ্চিন্তায় জর্জরিত, কোন দোয়া বা যিক্র বলে দিন, যা আমরা পাঠ করব আর যাতে আমাদের সমস্যা বা দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়। সচরাচর মানুষকে আমি একথাই লিখি যে, নামাযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। সিজদায় দোয়া করুন, নামাযে দোয়া করুন আর খোদার কাছে সাহায্য যাচনা করুন। কিন্তু আজ আমি একটি যিক্র বা দোয়ার কথা বলতে চাই, যা মহানবী (সা.)-এর সুন্নতও আর খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ দোয়াও বটে, যার অর্থের প্রতি প্রণিধান করে পাঠ করলে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার তৌহিদ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার পাশাপাশি খোদার নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের গণ্ডিতে স্থান পায় এবং সকল প্রকার অনিষ্ট থেকেও রক্ষা পায়। মহানবী (সা.) কেবল নিজেই প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর পূর্বে এসব আয়াত ও দোয়া পাঠ করতেন না বরং সাহাবীদেরও এগুলো পড়ার নসীহত করতেন এবং বিভিন্ন স্থানে তিনি (সা.) এসব দোয়া ও আয়াতের গুরুত্ব ও উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। এ প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিগত কর্মপন্থা বা আমল সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বা হাদীসও রয়েছে।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) ঘুমানোর পূর্বে সর্বদা 'আয়াতুল কুরসী', 'সূরা ইখলাস', 'সূরা ফালাক' এবং 'সূরা নাস' পড়তেন, অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের শেষ তিনটি সূরা এবং 'আয়াতুল কুরসী' তিনবার পাঠ করে দু'হাতে 'ফুঁ' দিতেন, এরপর পুরো শরীরে এমনভাবে দু'হাত বুলিয়ে নিতেন যে, মাথা থেকে আরম্ভ করে দেহের যে পর্যন্ত হাত পৌঁছানো সম্ভব সে স্থান পর্যন্ত হাত বুলাতেন।

অতএব তিনি (সা.) নিয়মিত যে কাজ করতেন আর রীতিমত করেছেন তা তাঁর সুন্নতে পরিণত হয়েছে আর সব মুসলমানেরই সেই কাজ করা উচিত। আমরা আহমদী, এ যুগে মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি সুন্নতের ওপর আমল করার প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) গুরুত্বের সাথে

যাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; তাই এক্ষেত্রে আমাদের বিশেষভাবে সচেষ্ট হওয়া উচিত। বিশেষত বর্তমানে আমরা যেসব পরিস্থিতির সম্মুখীন তাতে দোয়া, নামায এবং বিভিন্ন 'যিক্‌র' এর প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। কেবল নিজের ব্যক্তিগত, আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক চাহিদা পূরণের জন্যই নয় বরং জামা'তী ফেতনা, নৈরাজ্য এবং হিংসুক ও শত্রুদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যকীয় দায়িত্ব মনে করেও এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত।

এই যিক্‌র ও আয়াতের গুরুত্ব আরো অনেক হাদীসেও দেখতে পাওয়া যায়, যা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আয়াতুল কুরসী'র যতটুকু সম্পর্ক আছে, সে সম্পর্কে আমি দুই জুমুআ পূর্বেও আলোচনা করেছি।

আজকে পবিত্র কুরআনের শেষ তিনটি সূরা সম্পর্কে হাদীসের বরাতে কথা বলব। মহানবী (সা.) বার বার এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে নিজ সাহাবীদের এই সূরাগুলো পাঠ করার ব্যাপারে নসীহত করেছেন।

একটি রেওয়ায়েতে শেষ তিন সূরা বা তিন কুল পড়ে শরীরে 'ফুঁ' দেয়া সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন যে, প্রত্যেক রাতে মহানবী (সা.) যখন বিছানায় যেতেন তখন নিজের (দু'হাতের) তালুদ্বয়কে পরস্পর যুক্ত করে তাতে ফুঁ দিতেন আর 'কুলহু আল্লাহু আহাদ', 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' এবং 'কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস' পাঠ করতেন অর্থাৎ এই তিনটি সূরা পড়ে উভয় হাত শরীরে যথাসাধ্য বুলাতেন, তিনি তাঁর মাথা এবং মুখমণ্ডল থেকে হাত বুলানো আরম্ভ করে শরীরের যে অংশ পর্যন্ত তাঁর হাত পৌঁছানো সম্ভব হত তিনি তিনবার এমনটি করতেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফাযায়েলুল কুরআন)**

মহানবী (সা.) এতটাই নিয়মিত করতেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর অন্তিম ব্যাধিতে আক্রান্ত অবস্থায় এসব দোয়া নিজেই পড়তেন এবং মহানবী (সা.)-এর হাতে ফুঁ দিয়ে সেই হাতই তাঁর (সা.) দেহে বুলাতেন। যেমন হযরত আয়েশা (রা.)-এর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন রোগাক্রান্ত হতেন তখন কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস এবং কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক পাঠ করে তাঁর দেহে ফুঁ দিতেন। তিনি (রা.) বলেন, তাঁর রোগ যখন চরম রূপ ধারণ করে আমি এই সূরাগুলো তাঁর সামনে পাঠ করে তাঁরই নিজের হাত বরকতের উদ্দেশ্যে তাঁর দেহে বুলাতাম। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফাযায়েলুল কুরআন)**

অতএব, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হৃদয়ে এই ধারণা জাগ্রত হওয়া নিশ্চয়ই এ কারণে ছিল যে, মহানবী (সা.) এ ক্ষেত্রে খুবই নিয়মিত ছিলেন আর এর কল্যাণের গুরুত্বও হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন।

এরপর এসব সূরার কল্যাণ ও গুরুত্ব সম্পর্কে সাহাবীদের মাঝে কীভাবে সচেতনতা সৃষ্টি করেছিলেন সে সম্পর্কে হযরত উকবা বিন আমের (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, তিনি (সা.) এগিয়ে এসে আমার হাত ধরেন এবং বলেন, হে উকবা বিন আমের! আমি তোমাকে তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর এবং পবিত্র কুরআনে যেসব সূরা অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর মধ্য হতে সর্বশ্রেষ্ঠ তিনটি সূরা সম্পর্কে অবহিত করব কি? আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কেন নয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আপনার প্রতি নিবেদিত করুন। এরপর তিনি কুলহু আল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস পড়ে শোনান। এরপর বলেন,

হে উকবা! তুমি এগুলো কখনো ভুলে যেও না এবং এমন কোন রাত অতিবাহিত করবে না, যতক্ষণ না তুমি এই সূরাগুলো পাঠ করবে। উকবা (রা.) বলেন, যখন থেকে মহানবী (সা.) একথা বলেছেন যে, তুমি এগুলো ভুলবে না, তখন থেকে আমি এগুলো ভুলি নি আর এমন কোন রাত আমি অতিবাহিত করি নি যে রাতে আমি এগুলো পাঠ করি নি।**{মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ উকবা বিন আমের (রা.) ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮৯৫-৮৯৬}**

কাজেই, তাঁর এ কথা বলা যে, তুমি এগুলো ভুলবে না আর এমন কোন রাত কাটাবে না যাতে তুমি এগুলো পাঠ না করেছ; এতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি (সা.) নিজেও কতটা নিয়মিতভাবে এগুলো পাঠ করতেন। আল্লাহ্ তা'লার কথা, আদেশ-নিষেধ এবং দোয়াকে সবচেয়ে বেশি বাস্তবে রূপায়নকারী তিনিই ছিলেন আর এ কারণেই তিনি অন্যদেরকেও পরামর্শ দিতেন।

এরপর সূরা এখলাস অর্থাৎ যে সূরা 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' দ্বারা শুরু হয় সেই সূরার গুরুত্ব সম্পর্কে এক হাদীসে এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' পড়তে শুনেছেন, যিনি বার বার এটিই পড়ছিলেন। প্রভাতে সেই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে পুরো বিষয়টি বর্ণনা করেন। (বর্ণনার ধরণে) এমন মনে হচ্ছিল, সে যেন ঐ ব্যক্তিকে তুচ্ছ বা হেয় জ্ঞান করছিলো, তাই অভিযোগের সুরে বর্ণনা করছিল। মহানবী (সা.) তখন বলেন, **সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।** **(সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফাযায়েলুল কুরআন)**

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এ প্রসঙ্গে এক জায়গায়, এভাবে এর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন যে, মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের বলেন, তোমাদের কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়তে পারবে? সাহাবীদের জন্য এটি খুব কঠিন প্রশ্ন ছিল, তারা বলেন– হে আল্লাহ্র রসূল! আমাদের মধ্যে এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করার শক্তি বা সামর্থ্য কার আছে? তিনি (সা.) বলেন, 'আল্লাহুল ওয়াহেদুস সামাদ' অর্থাৎ সূরা এখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।**(সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফাযায়েলুল কুরআন)**

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনায়, সূরা এখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশ হওয়ার প্রেক্ষাপটে সহীহ্ মুসলিমে একটি হাদীস এভাবে লিপিবদ্ধ আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমরা একত্রিত হও, আমি তোমাদেরকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করে শোনাব। সবাইকে ডাক দেন যে, মসজিদে আস। অতএব, সবাই সমবেত হয় তখন মহানবী (সা.) বাইরে আসেন আর 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' পাঠ করেন এরপর তিনি (সা.) ভেতরে যান। সাহাবীরা বলেন, আমাদের মধ্য হতে কেউ বলে, আমার মনে হয় আকাশ থেকে কোন সংবাদ অর্থাৎ ওহী এসেছে, যে কারণে তিনি ঘরে প্রবেশ করেছেন বা ভেতরে গেছেন। পুনরায় মহানবী (সা.) বাইরে আসেন আর বলেন, আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, আমি তোমাদের সামনে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করব, মনোযোগ সহকারে শোন, সূরা এখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুস সালাত)**

তিনি (সা.) এটিকে এক তৃতীয়াংশ কেন আখ্যায়িত করেছেন? এর কারণ– আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় একত্ববাদ প্রমাণের জন্য এবং একে প্রতিষ্ঠার জন্য পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। অতএব, এই সূরায় সুস্পষ্ট শব্দে এবং পূর্ণাঙ্গীণভাবে একত্ববাদ বর্ণিত হয়েছে। তাই এতে ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছের প্রতি অভিনিবেশ ও আমল করে মানুষ প্রকৃত তৌহিদ বা একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর যখনই পবিত্র কুরআনকে এক আল্লাহ্র বাণী হিসেবে বিশ্বাস করে আমলের চেষ্টা করবে, সে

প্রকৃত তৌহিদকে বুঝবে এবং একে নিজ জীবনে বাস্তবায়নকারী হবে এবং এরপর পুরো কুরআনী শিক্ষার ওপর আমলেরও সামর্থ্য লাভ করবে। কাজেই, মানুষকে কেবল এতটুকু ভাবলেই চলবে না যে, আমি সূরা এখলাস পাঠ করেছি, তাই কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়ে ফেলেছি। এর অর্থ হল, তোমরা এটি পড় এবং তৌহিদ বা একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও আর এর ওপর আমল কর।

একইভাবে বিভিন্ন বর্ণনায় আরো কিছু আয়াত আছে যেগুলো সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, এটি একাংশ, এটি এক চতুর্থাংশ। যদি একে আক্ষরিক অর্থে নেয়া হয় তাহলে এই কয়েকটি আয়াত পাঠ করেই মানুষ বলবে, পুরো কুরআন পড়া হয়ে গেছে। অথচ এ ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর কথার মর্ম হল, এগুলো এমন বিষয় যার ওপর তোমরা আমল কর এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা ও প্রণিধান কর এবং একত্ববাদ বা তৌহিদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কর, তবেই তোমরা কুরআন পাঠকারী গণ্য হবে। পবিত্র কুরআন কী? পবিত্র কুরআনের শিক্ষা মূলত একত্ববাদ বা তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্যই। যার জন্য প্রত্যেক মানুষকে চেষ্টাও করা উচিত আর দোয়াও করা উচিত।

এরপর হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ থেকে আরেকটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) এক ব্যক্তিকে এক অভিযানের আমীর নিযুক্ত করে পাঠান (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন) যিনি তার সাথীদের নামায পড়াতেন আর কুলহু আল্লাহু আহাদ পড়ে তিলাওয়াত সমাপ্ত করতেন। সাহাবীরা ফিরে আসার পর মহানবী (সা.)-এর কাছে একথা উল্লেখ করলে তিনি (সা.) বলেন, তাকে জিজ্ঞেস কর সে কেন এমনটি করে? সাহাবীরা তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এর কারণ হল, এটি রহমান খোদার বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই আমি এটি পাঠ করতে পছন্দ করি। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা তাকে শুভসংবাদ দাও, আল্লাহ্ তা'লাও তাকে ভালোবাসেন। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুস সালাত)**

এরপর বুখারীতে হযরত আনাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে এ প্রেক্ষাপটে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, এক আনসারী মসজিদে কুবায় তাদের ইমামের দায়িত্ব পালন করতেন, নামাযে যেসব সূরা পঠিত হয় সেগুলোর যে কোন সূরা আরম্ভ করার পূর্বে তিনি 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' অর্থাৎ সূরা ইখলাস পড়তেন, এটি পড়ার পর অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন আর প্রত্যেক রাকাতেই তিনি এমনটি করতেন। এ সম্পর্কে তার সাথীরা তার সাথে কথা বলে এবং বলে যে, তুমি সূরা এখলাসের মাধ্যমে তিলাওয়াত আরম্ভ কর আর এটিকে যথেষ্ট মনে না করে এর সাথে অন্য আরেকটি সূরাও পড়। হয় শুধু সূরা এখলাস পড় বা এটি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন সূরা পড়। তিনি বলেন, আমি এটি আদৌ পরিত্যাগ করব না। তোমরা যদি এই রীতিতে তোমাদের ইমামতি করা পছন্দ কর তাহলে আমি ইমাম থাকব আর যদি এটি পছন্দ না হয় তাহলে আমি তোমাদের পরিত্যাগ করব অর্থাৎ আমি ইমামের দায়িত্ব ছেড়ে দিব কিন্তু এই সূরা পরিত্যাগ করব না। তারা তাকে নিজেদের মধ্যে সর্বোত্তম জ্ঞান করত তাই তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ইমাম বানানো তারা পছন্দ করেনি। তারা যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে এই ঘটনার সংবাদ দেয় তখন তিনি (সা.) বলেন, হে উমুক ব্যক্তি! তোমার সাথীরা তোমাকে যা করতে বলে সে কাজ থেকে কোন বিষয়টি তোমাকে বারণ করে (অর্থাৎ সূরা এখলাস পড়া বাদ দিয়ে অন্য কোন সূরা পড় বা শুধু সেটিই পড় আর অন্য সূরা পড়ো না। উভয়টি এক সাথে পড়ার কারণ কি?) আর প্রতি রাকাতেই তুমি আবশ্যকীয়ভাবে এ সূরাটি তিলাওয়াত করে থাক এরই বা কারণ কি? তিনি বলেন, এই সূরা আমার কাছে খুবই প্রিয়। তিনি (সা.) বলেন, এর প্রতি ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেছে। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আযান)**

এরপর হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) বর্ণনা করেন, মুশরিকরা যখন মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করে, আমাদেরকে আপনার প্রভুর বংশ পরিচয় দিন। তখন আল্লাহ্ তা'লা 'কুলহু আল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ' নাযিল করেন। অতএব, সামাদ যিনি কারো পিতা নন, তারও কোন পিতা নেই। কেননা, এমন কোন কিছুই নেই, যা জন্ম নিয়েছে অথচ মরবে না। যা জন্ম নিয়েছে অবশ্যই তা মরবে এবং তার কোন না কোন উত্তরাধিকারীও থাকবে। কিন্তু মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ তা'লা মারাও যাবেন না আর তাঁর কোন উত্তরাধিকারীও থাকবে না। **'ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুআন আহাদ'** বলেছেন যে, তাঁর সদৃশ আর কেউ নেই, তাঁর মত কেউ নেই এবং তাঁর সদৃশ কোন কিছুই নেই। **(সূনানুত তিরমিযী, আবওয়াবু তফসীরুল কুরআন)**

আরেক জায়গায় হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে এভাবে রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, মানুষ পরস্পরকে প্রশ্ন করে, এমনকি তারা বলে, আল্লাহ্ তা'লা উমুককে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ একটি জিনিসকে আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেছেন। এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহ্ তা'লাকে কে সৃষ্টি করেছে? [মহানবী (সা.)-এর যুগেও এই প্রশ্ন করা হত আর আজও ব্যাপক পরিসরে এই প্রশ্নেরই অবতারণা করা হয়।] তিনি (সা.) বলেন, তোমরা যখন এমন লোকদের দেখ তখন 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' সূরা শেষ পর্যন্ত পড়। (অর্থাৎ সূরা এখলাস পুরোটাই পড় আর এর অর্থ সম্পর্কে প্রণিধান কর। এর ফলে, তোমরা বুঝতে পারবে, আল্লাহ্‌র কোন স্রষ্টা নেই, তিনি অনাদি ও অনন্ত, তিনি অনাদিকাল থেকে আছেন আর চিরকাল থাকবেন।) তিনি (সা.) বলেন, তার উচিত, শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে আসা তাহলে শয়তান তার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। **(আল্ আবানাতুল কুবরা)**

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে (এক স্থানে) আসি, তিনি (সা.) এক ব্যক্তিকে 'কুলহু আল্লাহু আহাদ আল্লাহুস্ সামাদ' পাঠ করতে শোনেন। মহানবী (সা.) বলেন, আবশ্যক হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী আবশ্যক হয়ে গেছে? তিনি (সা.) বললেন, যে নিষ্ঠার সাথে সে পড়ছে তাতে তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে গেছে। **(সূনানুত তিরমিযী, আবওয়াবু তফসীরুল কুরআন)**

হযরত সোহায়েল বিন সা'দ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে এবং নিজের দারিদ্রের অভিযোগ করে। তিনি (সা.) বলেন, তুমি যখন তোমার গৃহে প্রবেশ কর তখন ঘরে যদি কেউ থাকে তাহলে 'আসসালামু আলাইকুম' বল আর যদি কেউ নাও থাকে তবে নিজের প্রতিই শান্তির দোয়া প্রেরণ কর অর্থাৎ 'আসসালামু আলাইকুম' বল। এতে তুমি সালাম বা শান্তি লাভ করবে আর একবার সূরা এখলাস পাঠ কর। অতএব সেই ব্যক্তি এমনটিই করে। এরফলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এতবেশি জীবনোপকরণ দান করেন যে, তার প্রতিবেশিও তা থেকে কল্যাণমন্ডিত হতে থাকে। **(বৈরুত থেকে ২০০৩ সনে প্রকাশিত রূহুল বয়ান)**

অর্থাৎ এর কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এতটা জীবনোপকরণ দান করেন যে, একটা সময় এমন ছিল যখন সে নিজেই খুব দরিদ্র ছিল, অনাহারে কাটাতে হতো। এরপর এতটা প্রাচুর্য আসে যে, সে তার প্রতিবেশিদেরকেও সাহায্য করতো।

অতএব, মানুষ যদি তৌহিদ বা একত্ববাদের পাঠ শিখে এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় আর আল্লাহ্ তা'লাকে সকল শক্তি এবং ক্ষমতার আধার মনে করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে অশেষ দানে ভূষিত করেন। আল্লাহ্ তা'লা অন্যত্র বলেন, তিনি মুত্তাকিদের বা খোদাভীরুদের এমন সব স্থান থেকে রিয্ক দিয়ে থাকেন যার কথা সে কল্পনাও করতে পারে না।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে এবং বলে, এই সূরা অর্থাৎ 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' আমার কাছে খুব প্রিয়। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, **এই সূরার প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবে**। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, হাদীস নংঃ ১২৪৩২)**

পুনরায় হযরত জাবের (রা.)- কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, **মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন পঞ্চাশবার 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' পাঠ করবে তাকে কিয়ামত দিবসে তার কবর থেকে ডেকে বলা হবে, ওঠ! আর জান্নাতে প্রবেশ কর**। **(আল্ মু'জিমুল আওসাত, হাদীস নংঃ ৯৪৪৬)**

ইবনে দেলমী, যিনি নাজ্জাশীর ভাগ্নে ছিলেন আর মহানবী (সা.)-এর সেবাও করেছেন; তিনি (রা.) বলেন– মহানবী (সা.) বলেছেন, **যে ব্যক্তি নামাযে বা এর বাইরে শতবার 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' পাঠ করে আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য আগুন থেকে মুক্তি অবধারিত করে দিয়েছেন**। **(আল্ মু'জিমুল কবীরুত তিবরানী, ১৮তম খণ্ড, পৃঃ ৩৩১, হাদীস নংঃ ৮৫২)**

অতএব, এই হল সূরা এখলাসের গুরুত্ব। আমরা রাতে যখন এটি তিলাওয়াত করব তখন খোদার একত্ববাদের বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে পাঠ করা উচিত। আমরা যখন বলব, আল্লাহ্ 'আহাদ' বা এক তখন একই সাথে তিনি যে 'সামাদ' অর্থাৎ স্বনির্ভর ও পরনির্ভরস্থল সেই মোকাম এবং মর্যাদাও দৃষ্টিতে আসা উচিত। 'সামাদ' সেই সত্তাকে বলা হয় যে, কারো মুখাপেক্ষী নয়, আর যে কখনও ফুরাবে না এবং ধ্বংসও হবে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,'সামাদ' এর অর্থ হল, **"তিনি ব্যতীত অন্য সকল জিনিস সৃষ্টি হওয়া সম্ভব আর** সেসব **একদিন বিলুপ্ত হবে"** **[বারাহীনে আহমদীয়া, পৃঃ ৪৩৩ টিকা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তফসীর হতে উদ্ধৃত ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৫৬]**

অর্থাৎ যা সৃষ্ট বা সৃষ্টি তা ধ্বংস হয়ে যাবে অর্থাৎ নশ্বর কিন্তু খোদার সত্তা হল,'সামাদ'। মানুষ মনে করে, সামাদের অর্থ হল, পরবিমুখ। তাঁর পরবিমুখতার অর্থ হল, তিনি ধ্বংসও হবেন না আর বিলুপ্তও হবেন না এবং তাঁর মত কোন কিছু সৃষ্টিও হতে পারে না। অতএব, ইনিই আমাদের খোদা, যিনি অনাদি ও অনন্ত, অনাদিকাল থেকে আছেন আর চিরকাল থাকবেন।

তিনি (আ.) বলেন, **"খোদা স্বীয় সত্তা, গুণাবলী ও প্রতাপে এক-অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। প্রতিটি অণু বা বিন্দুর** অস্তিত্বের **উৎস তিনিই। তিনি সকল বস্তুর জন্য কল্যাণের উৎস।"** (অর্থাৎ বিশ্বের হিতসাধনকারী ও কল্যাণসাধনকারী সত্তাধিকার একমাত্র তাঁরই। তাঁর সত্তা থেকেই সকল কল্যাণের ধারা প্রষ্ফূটিত হয়) **"আর তিনি কারো দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত হন না"**। (অর্থাৎ তাঁর কল্যাণ সাধনকারী কেউ নাই, একমাত্র তিনিই পৃথিবীকে কল্যাণমণ্ডিত করছেন।) **"তিনি কারো পুত্র নন আর কারো পিতাও নন। আর এটি হওয়া কীভাবে সম্ভব হতে পারে, কেননা তাঁর মত সত্তা দ্বিতীয়টি নেই। কুরআন বার বার খোদা তা'লার শ্রেষ্ঠত্ব উপস্থাপন করে এবং তাঁর মাহাত্ম্য তুলে ধরে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে, দেখ! হৃদয় এমন খোদার প্রতিই আকৃষ্ট হয় যিনি মৃত, দুর্বল আর স্বল্প দয়ালু নন এবং স্বল্প শক্তির অধিকারীও নন"**। **[ইসলামী নীতি দর্শন, পৃঃ ১০৩, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তফসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৫৭ থেকে উদ্ধৃত]**

সূরা এখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা আন্ নাস অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে হযরত উকবা বিন আমের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন– মহানবী (সা.) বলেছেন, আজ রাতে এমন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যেগুলোর মত আয়াত পূর্বে কখনো চোখে পড়ে নি। আর তাহল, **কুলহু আল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস**। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুস সালাত)**

এছাড়া হাদীসে তিন কুল পাঠ করার গুরুত্ব সম্পর্কে রেওয়ায়াত রয়েছে। হযরত উকবা বিন আমের জুহ্নী বর্ণনা করেন, একবার আমি এক যুদ্ধাভিযানে মহানবী (সা.)-এর বাহনের লাগাম ধরে সামনে হাঁটছিলাম। তিনি (সা.) বলেন, **"হে উকবা! পাঠ কর, তখন আমি তাঁর প্রতি কর্ণপাত করি যেন তিনি যা বলবেন তা শুনে আমি পড়তে পারি। কিছুক্ষণ পর তিনি বলেন, হে উকবা পড়, আমি পুনরায় তাঁর কথা শোনার জন্য মনোযোগ নিবদ্ধ করি, কী পাঠ করব (তা জানার জন্য)? তৃতীয়বার একই কথা বললে আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কী পড়ব? তিনি (সা.) বলেন, সূরা 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' এরপর তিনি এ সূরার শেষ পর্যন্ত পড়েন, এরপর তিনি সূরা 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন আমিও তাঁর সাথে পড়তে থাকি। পুনরায় তিনি সূরা 'কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস' শেষ পর্যন্ত পড়েন আর আমিও তাঁর সাথে সাথে পাঠ করি। এরপর তিনি বলেন এগুলোর মত সূরা বা বাণীর মাধ্যমে (পূর্বে আর) কেউ খোদার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে নি।"** (সুনান নিসাঈ, কিতাবুল ইসতেয়াযা, হাদীস নংঃ ৫৪৩০)

অর্থাৎ এগুলো এমন দোয়া এবং এমন বাণী যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে এসে যায় আর কখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না এবং সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়। খোদার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার এর চেয়ে উত্তম আর কোন উপায় নেই। বিভিন্ন হাদীসে এমন রেওয়ায়েত রয়েছে যা হতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি (সা.) বলেছেন, এর চেয়ে উত্তম খোদার আর কোন আশ্রয়স্থল নেই।

এরপর সূরা ফালাক এবং সূরা নাস সম্পর্কে হযরত উকবা বিন আমের (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি এক সফরে মহানবী (সা.)-এর বাহনের লাগাম ধরে হাঁটছিলাম। তিনি (সা.) বলেন, হে উকবা! আমি কি তোমাকে এমন দু'টি সূরা শেখাব না, যার তিলাওয়াত খুবই কল্যাণকর। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কেন নয়। তিনি (সা.) বললেন, **কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক** এবং **কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস**। এরপর ফজরের নামাযের জন্য তিনি যখন যাত্রা বিরতি দেন তখন এ সূরাগুলোই তিনি তিলাওয়াত করেন, এগুলোই পাঠ করেন। নামায শেষ করার পর আমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি বলেন, হে উকবা! তুমি এভাবে তাকিয়ে আছ কেন? (হয়তো তিনি ভাবছিলেন মহানবী (সা.) খুব ছোট্ট সূরা তিলাওয়াত করেছেন। তিনি বলেন, এই সূরাগুলোতে তো সব কিছুই আছে।) (সুনান আবু দাউদ, হাদীস নংঃ ১৪৬২)

একটি হাদীসে আছে, হযরত আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) জিন্ন ও মানুষের কুদৃষ্টি থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইতেন। কিন্তু এই সূরা দু'টি যখন অবতীর্ণ হয় তখন তিনি (সা.) এগুলোকে আঁকড়ে ধরেন এবং বাকি সবকিছু পরিত্যাগ করেন। পূর্বে এ সংক্রান্ত যে দোয়াই ছিল সেগুলো বাদ দিয়ে শুধু এগুলোই পাঠ করতেন। (সুনান ইবনে মাজাহ্, হাদীস নংঃ ৩৫১১)

হযরত ইবনে আবেস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার মহানবী (সা.) আমাকে বলেন, হে ইবনে আবেস! আমি কি তোমাকে আশ্রয় প্রার্থনা করা–সংক্রান্ত সর্বোত্তম শব্দমালা সম্পর্কে অবহিত করব না? সর্বোত্তম আশ্রয় কীভাব প্রার্থনা করা যায়, যার মাধ্যমে আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে? আমি নিবেদন করলাম হে আল্লাহ্‌র রসূল! কেন নয়। তিনি বললেন, **সেই সূরাগুলো হল, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস**। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩২২, হাদীস নংঃ ১৫৫২৭)

এরপর শেষ দু'টি সূরার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে এক সাহাবী বলেন, আমরা একবার মহানবী (সা.)-এর সফরসঙ্গী ছিলাম, বাহন কম থাকার কারণে মানুষ পালা করে বাহনে আরোহণ করতো। একবার মহানবী (সা.) এবং আমার নিচে নামার পালা ছিল। মহানবী (সা.) পিছন থেকে আমার কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন, **আউযু বিরাব্বিল ফালাক** পড়। আমি এ বাক্যটি

পাঠ করি। এভাবে মহানবী (সা.) পুরো সূরাটি পাঠ করেন, আমিও তাঁর সাথে সাথে তা পাঠ করি। পুনরায় একইভাবে **আউযু বিরাব্বিন্নাস** পড়ার নির্দেশ দেন এবং পুরো সূরা তিনি তিলাওয়াত করেন আর আমিও তা তিলাওয়াত করি। এরপর তিনি (সা.) বলেন, **নামায পড়ার সময় এই উভয় সূরা তিলাওয়াত করবে।** **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৯১৮, হাদীস নংঃ ২১০২৫)**

উকবা বিন আমের আল্ জুহনী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি এক সফরে মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। ফজর উদিত হলে তিনি (সা.) আযান দেন এবং একামতও দেন আর এরপর আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়ে **মুয়াওভেযাতাঈন** (অর্থাৎ সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পাঠ করেন। নামায শেষ করার পর তিনি বলেন, তুমি কেমন পেয়েছ? (এ ঘটনাটি পূর্বের রেওয়ায়েতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।) আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি অবশ্যই বাস্তবচিত্রই দেখেছি। মহানবী (সা.) বলেন, যখনই তুমি ঘুমাতে যাবে এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হবে এ দু'টি সূরা পাঠ করো। **(আবু বকর বিন আবি শায়বা প্রণিত আল্ মুসান্নাফ ফিল আহাদিস ওয়াল আসার, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৩)**

অতএব, এ হল এই সূরাগুলোর গুরুত্ব। এ যুগে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি আর শয়তানের আক্রমন থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আর জামা'তী দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র হচ্ছে তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য এগুলো পাঠের গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে। আজকাল ইসলামের বিরুদ্ধে একদিকে ইসলাম বিরোধী অপশক্তি চরম ধূর্ততার সাথে চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং কৌশল অব্যাহত রেখেছে, অপরদিকে নামধারী মুসলমান আলেম ও মুসলমান নেতারা এমন এক পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে যে, সর্বত্র ফিতনা এবং নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে। মুসলমান আলেম সমাজ মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদের উত্তেজিত করে শয়তানী অপশক্তিকে আরো সুযোগ করে দিচ্ছে যেন তাদের শক্তি আরো বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে নাস্তিকতাও আজকাল বর্তমানে চরম রূপ ধারণ করেছে। সূরা ফালাকের বরাতে এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে ব্যাখ্যা করেছেন যে,

"তোমরা যারা... মসীহ্ মওউদের শত্রুদের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হবে তারা এভাবে দোয়া প্রার্থনা কর যে, আমি সৃষ্টির অনিষ্ট তথা আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রু থেকে সেই আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই, যিনি প্রভাতের মালিক। অর্থাৎ আলোর প্রকাশ তাঁরই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।" (এ আলো হল আধ্যাত্মিক আলো, যা মসীহ্ মওউদের আগমণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।) **"এবং আমি সেই অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা... মসীহ্ মওউদের অস্বীকার–সংক্রান্ত ফিতনার রাত।"** **[তোহফাহ্ গোলড়াবীয়াহ্, পৃঃ ৭৮, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তফসীরের উদ্ধৃতি, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৬২]**

এদের মাঝে প্রধানত রয়েছে ইসলামের শত্রুরা, যারা ইসলামী শিক্ষাকে আপত্তির লক্ষ্যে পরিণত করে আর দ্বিতীয় শ্রেণি হল, মুসলমান আলেমরা, যারা নিজেদের ভুলভ্রান্তি পরিত্যাগ করতে চায় না আর মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করার কাজে রত। এদের মাঝে পাকিস্তানি আলেমদের আমরা তালিকার শীর্ষে দেখতে পাই।

অতএব, এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের আহমদীদের বিশেষভাবে এই সুন্নতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **"সূরা ফালাকে যে 'শাররে গাসিকিন ইযা ওয়াকাব' বলা হয়েছে, এতে অন্ধকার রাতের অনিষ্টকর নৈরাজ্য থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া রয়েছে। গাসেক** বলা হয় রাতকে আর **ওয়াকাব** এর অর্থ হল, অন্ধকার ও অমানিশা ছেয়ে যাওয়া। আর এই অন্ধকার

রাতের নৈরাজ্য মসীহ্ মওউদকে অস্বীকার করা–সংক্রান্ত নৈরাজ্যের তমসাচ্ছন্ন রাত, যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

পরিতাপ! মুসলমানদের জন্য কেননা, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে একটি দোয়া শিখিয়েছেন আর আলোর পর অন্ধকার ও অমানিশার নৈরাজ্য থেকে নিরাপদ থাকার জন্য মহানবী (সা.) বলেছেন যে, এই দোয়াগুলো তোমরা কোন বিরতি না দিয়ে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পাঠ করো, যেন তোমরা একত্ববাদের ওপরও প্রতিষ্ঠিত থাকতে পার আর অন্ধকার ও অমানিশার নৈরাজ্য থেকেও নিরাপদ থাকতে পার। কিন্তু মুসলমানরা এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে নি। অধিকাংশ মুসলমান এখন এসব নৈরাজ্যে তলিয়ে যাচ্ছে আর এ কারণেই আজ অমুসলমানরা মুসলমানদের ওপর আপত্তি করার সুযোগ পাচ্ছে। যাহোক, মুসলমানদের এই অবস্থা আমাদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করে যে, এই সূরাগুলো যেন আমরা মনোযোগ সহকারে পড়ি, যাতে করে এসব অমানিশা থেকে আমরা নিরাপদ থাকি। **শাররিন নাফ্ফাসাতি ফিল উকাদ**– থেকেও আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে থাকি। **নাফ্ফাসাত** এর যে অনিষ্ট রয়েছে (অর্থাৎ ফুৎকারের অনিষ্ট যা গ্রন্থিতে ফুৎকার করে) যে গ্রন্থি রয়েছে তা থেকেও যেন আমরা আল্লাহ্র আশ্রয়ে থাকতে পারি। অর্থাৎ সেসব মানুষ থেকে যারা ইসলাম ও আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে চরম ধূর্ততার সাথে মানুষের হৃদয়ে হিংসা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করছে। আর এ ক্ষেত্রে যেমনটি আমি বলেছি, অমুসলমান এবং নাম-সর্বস্ব আলেম সমাজ উভয়েই এর অন্তর্ভুক্ত। এক শ্রেণি, ধর্মের প্রতি বিরোধিতার কারণে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অর্থাৎ অমুসলমানরা ইসলাম বিদ্বেষের কারণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণি ধর্মের নামে খোদা-প্রেরিত মহাপুরুষের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই উভয় শ্রেণিই সেই দলের অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, **ওয়া মিন শাররিন্ নাফ্ফাসাতে ফিল উকাদ**।

পুনরায় 'সূরা নাস' এ আল্লাহ্ তা'লার 'রুবুবিয়্যাত' এবং 'মালিকিয়্যাত' তথা প্রকৃত উপাস্য হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। এটি বর্ণনা করে তাঁর আশ্রয় যাচনা করা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার দোয়া করা হয়েছে। আজকাল নাস্তিকতা ও পার্থিবতার আগ্রাসন তুঙ্গে আর বস্তুবাদিতা মোটের ওপর স্বীয় থাবা সমাজের ওপর এতটা বিস্তৃত করেছে যে, অনেক যুবক এতে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। অতএব, এই দোয়া পড়ে নিজেদের গায়ে ফুঁ দেয়ার পাশাপাশি সন্তানদের গায়েও যেন আমরা ফুঁ দেই, যাতে করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। আর তারা যেন ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং খোদার একত্ববাদের জ্ঞানে জ্ঞানী হয় আর একত্ববাদের বিষয়টি অনুধাবনে সক্ষম হয়।

আমরা সবাই এসব সূরার বিষয়বস্তু অনুধাবন করে মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবো, আল্লাহ্র একত্ববাদের বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট হবে এটিই আল্লাহ্র কাছে আমার প্রার্থনা। তিনি ব্যতীত অন্য কারো সামনে যেন আমরা মাথা নত না করি, তাঁকেই যেন সকল শক্তির উৎসস্থল জ্ঞান করি। শুধু বিশ্বাসে নয় বরং প্রতিটি কর্মের মাধ্যমে আমরা যেন প্রমাণ করি যে, আল্লাহ্ তা'লাই সকল ক্ষমতার উৎস, সকল আলোর উৎস এবং তিনিই সকল কল্যাণের প্রস্রবণস্থল। সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষের কাছে কোন প্রত্যাশা রাখার পরিবর্তে খোদার সামনে বিনত হোন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনে যে আলো আমরা লাভ করেছি, যা সত্যিকার অর্থে মহানবী (সা.)-এর আলোরই প্রকৃত প্রতিফলন, আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করি, খোদা যেন সব সময় আমাদেরকে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর আমরা যেন কখনো

অন্ধকার ও অমানিশায় হাবুডুবু না খাই। আর আল্লাহ্ তা'লার বিভিন্ন নিয়ামতরাজির মাঝে খিলাফতরূপী যে নিয়ামত আমরা পেয়েছি এর সাথে যেন আমরা সদা সম্পৃক্ত থাকি। সকল অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে স্বীয় নিরাপত্তার বেষ্টনীতে আশ্রয় দিন, তা ধর্মীয় অনিষ্ট হোক বা জাগতিক। সকল হিংসুকের হিংসা এবং তার ক্ষতি থেকে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের নিরাপদ রাখুন। আল্লাহ্ তা'লাকেই সব সময় আমাদের প্রভু ও প্রতিপালক জ্ঞান করে আমরা যেন তাঁর আশ্রয়গণ্ডিতে থাকি। খোদা তা'লাকেই সকল বাদশাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি এবং তাঁর মালিকিয়্যতে পূর্ণ বিশ্বাস পোষণকারী হই। সেই সত্যিকার উপাস্যের প্রকৃত অর্থে ইবাদত করে আমরা যেন প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর আশ্রয়ের বেষ্টনীতে থাকার চেষ্টা করি।

কুমন্ত্রণা সৃষ্টিকারীদের অনিষ্ট থেকে দূরে থাকুন, তার থেকে আল্লাহ্র আশ্রয়ে আসুন। নিজেদের হৃদয়কেও সকল কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করুন। আর এর জন্য খোদার কাছে আশ্রয় যাচনা করতে থাকুন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন আর ঘুমানোর পূর্বে মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশ অনুসারে আমরা এসব আয়াত বা দোয়া নিয়মিতভাবে পাঠ করে যেন নিজেদের গায়ে ফুঁ দেই, খোদা তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।